যুগান্তর

তারিখ 21 JAN 2009
পৃষ্ঠা

ক্যাম্পাসে কী হচ্ছে?

■ হাসনাত আবদুল হাই ■

সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শান্তিপূর্ণ পরিবেশে যার ফলাফল নিয়ে বিরোধীদল কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করলেও সমালোচনামুখর হয়নি। আন্দোলন-বিক্ষোভের হুমকিও দেয়নি। নির্ধারিত সময়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের মাধ্যমে ক্ষমতাও হস্তান্তরিত হয়েছে। আর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কয়েকজন হলেও বিরোধী দল উপস্থিত থেকে সমস্ত প্রক্রিয়াটাকে বৈধতা দিয়েছে। গণতন্ত্রের নতুন যাত্রায় এসবই ইতিবাচক ঘটনা যা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার সঞ্চার করেছে।

অশনি সংকেত দেখা দিয়েছে আকাশের ভিন্ন কোণে। যা কিছুটা অপ্রত্যাশিত। নির্বাচনের ফলাফল জানার পরপরই দেশের প্রায় সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সদস্য ও নেতারা চর দখলের মত তৎপরতা দেখাতে শুরু করেছে। আবাসিক হল থেকে বিরোধী পক্ষের ছাত্রদের বার করে দিয়ে সেসব হল দখল করে নিয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। এরপর তারা শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন যা প্রায় প্রতিটি ক্যাম্পাসে সৃষ্টি করেছে উত্তেজনা এবং বিশৃংখলা। উত্তেজনার জের হিসেবে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে।

সব চেয়ে দায়িত্বশীল এবং সম্মানজনক পদক্ষেপ নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য। নতুন সরকার ক্ষমতায় বসার পরপরই তিনি পদত্যাগ করেছেন, যে জন্য সেখানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিঘ্নিত হয়নি। হলগুলো দখলের ঘটনা অবশ্য আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। উপাচার্যগণ এখন পর্যন্ত সরকারের সমর্থনকারীদের মধ্য থেকে নিয়োগ পেয়ে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্যও তাই ছিলেন। তিনি জানতেন তাকে নিয়ে অচিরেই ক্যাম্পাসে নতুন সরকারের সমর্থনকারী ছাত্র ও শিক্ষকরা বিক্ষোভ-আন্দোলন শুরু করবে। তাই তিনি সময়ক্ষেপণ না করে নিজেই সসম্মানে বিদায় নিয়েছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আইনভিত্তিক অবস্থান নিয়েছেন যার জন্য তাকে দোষ দেয়া যায় না। তিনি বলেছেন–ছাত্রদের হুমকি এবং চাপের মুখে তিনি পদত্যাগ করবেন না। সরকারের নির্দেশ মেনে নেবেন। অর্থাৎ তিনি তার মেয়াদের বাকি সময়টুকু দায়িত্ব পালন করেই শেষ করতে চান। বিদ্যমান বাস্তবতায় তা হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু এ কথা বলার অধিকার তার আছে। বিক্ষোভকারী ছাত্ররা তাদের দাবি নিয়ে এতোটাই একরোখা হয়েছে যে, তারা উপাচার্যের অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। ক্যাম্পাস থেকে বাসায় যাওয়া-আসাও তারা বন্ধ করে দিয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। তাদের কোপানলে পড়েছেন রেজিস্ট্রার মহোদয়ও। এদের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগের সদস্যদের অভিযোগ যে তারা ছাত্রশিবিরের সদস্যদের এতদিন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এসেছেন। এটাও ক্যাম্পাস রাজনীতির বাস্তবতা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেহেতু রাজনৈতিক বিবেচনায় নিযুক্ত হয়ে এসেছেন সেজন্য তাদেরকে সরকার সমর্থনকারী ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের নানাভাবে সন্তুষ্ট রাখতে হয়। ঢাকায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও উত্তেজনা ও সংঘর্ষ ঘটেছে ছাত্রদেরকে কেন্দ্র করে এবং তারা একই দলের। ছাত্রলীগের দুইটি অংশের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দেয়ায় তারা একে অন্যের হাত থেকে ক্ষমতা ও প্রভাব একচ্ছত্রভাবে পাওয়ার জন্য শক্তির পরীক্ষায় নেমেছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ও ছাত্র বিক্ষোভ ও ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের প্রভাব বিস্তারের ফলশ্রুতি। তাদের বিক্ষোভ, আন্দোলন ও সংঘর্ষের ফলে পুরনো ঢাকার একাংশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ সব ক্যাম্পাসে পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু তারা বড় রকমের সংঘর্ষ বন্ধ করতে পারলেও জনমনে অস্থিরতা রোধে অপারগ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে অবশ্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা যেন তাদের কর্তব্য পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন না করে। পুলিশ- আনসার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে যা করবে তা হলো গা বাঁচিয়ে চলা। ছাত্রলীগ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অঙ্গদল এখন নেই কিন্তু তাদের সমর্থন করে একথা সবাই জানে। সুতরাং তাদের উপর খড়্গহস্ত হতে পুলিশ আনসার কিছুটা ইতস্তত করবেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে যাই বলা হোক না কেন। বিশ্ববিদ্যায়ের ক্যাম্পাসে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটি আইন-শৃঙ্খলার নয়, রাজনীতির। এ পর্যন্ত এটাই নিয়ম হয়ে গিয়েছে যে যখন যে দল ক্ষমতায় আসবে তাদের পক্ষের শিক্ষকরাই উপাচার্য, প্রভোষ্ট, রেজিস্ট্রার এসব পদে নিযুক্ত হবেন। এটাও নিয়ম হয়ে গিয়েছে যে ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনই ক্যাম্পাসে কর্তৃত্ব করবে। তাদের কথা বা সুপারিশ অনুযায়ী ভর্তি, হলে সিট ইত্যাদি হতে হবে। ছাত্র সংগঠনগুলো ক্যাম্পাসের কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে চায় বাণিজ্যিক কারণেও। যে ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পসে কর্তৃত্বের অধিকারী তারা টেন্ডার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা নিয়ে থাকে। আশেপাশে যেসব ব্যবসায়ী ও দোকানদার আছে তাদের কাছ থেকে চাঁদা নেয়ার অধিকারও তারাই পেয়ে থাকে। সুতরাং ক্যাম্পাসে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ছাত্র সংগঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এতদিন ক্ষমতাসীন দল ও সরকার সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠনের এইসব তৎপরতা নীরবে সমর্থন করে এসেছে। এখন আর অঙ্গ দল নেই। কাগজে বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তেমন পরিবর্তন তো এত তাড়াতাড়ি আসতে পারে না। তাই সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠন বেপরোয়া হতে পেরেছে। সরকার তাদের দমনে কঠোর হতে পারবে বলে মনে হয় না। তবে এটা দেখার বিষয়। যদি সত্যিই কঠোর হতে পারে তাহলে বোঝা যাবে যে, রাজনৈতিক দলগুলো যখন নিজেদের গঠনতন্ত্র সংশোধন করে অঙ্গ দল হিসেবে ছাত্র সংগঠন বাদ দিয়েছিল তখন সেখানে আন্তরিকতা ছিল। আর যদি কঠোরভাবে তেমন কিছু না করা হয় তাহলে আগের মতোই ছাত্র সংগঠনগুলো নিজ নিজ রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড় বৃত্তি করে যাবে। এর ফলে ক্যাম্পাসের শান্তি মাঝেমধ্যেই বিঘ্নিত হবে। অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। নির্বাচন কমিশন ছাত্র সংগঠনের বিধ্বংসী ভূমিকার কথা মনে রেখেই এমন শর্ত দিয়েছিল যে, কোন রাজনৈতিক দলের ছাত্র অঙ্গদল থাকবে না। এটা ছিল রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্দেশ্য। এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাগজের সেই শর্ত কিছুটা পূরণ হলেও বাস্তবে হবে কিনা এখনই তার আভাস পাওয়া যাবে। যদি সরকার আন্দোলনকারী ছাত্রদের কঠোরভাবে দমন করে, তাদের প্রতি সমর্থন না জানায় তাহলে বুঝতে হবে যে, তাদের বোধোদয় হয়েছে এবং রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য একটা বড় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এর ফলে ক্যাম্পাসে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে এবং শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ বজায় থাকবে। এতে উপকৃত হবে সমস্ত জাতি, কেননা আজকের ছাত্ররা ভবিষ্যতের নাগরিক। তাদেরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে ক্যাম্পাসে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিয়ে এসে জাতির ভবিষ্যৎকেই ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে।

উপাচার্য নিয়োগের সঙ্গেও ক্যাম্পাসের শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সম্পর্ক রয়েছে। এতদিন যেভাবে উপাচার্য নিয়োগ পেয়ে এসেছেন সেখানে রাজনৈতিক বিবেচনা বেশি কাজ করেছে। সিনেটের প্যানেলে যে তিনটি নাম থাকে তারা সবাই ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক এবং দলীয় রাজনীতি করেন। ফলে উপাচার্য নিযুক্ত হয়ে দলের শিক্ষক, ছাত্র ও দলের স্বার্থের জন্যই তাকে কাজ করতে হয়েছে। তাকে বিতর্কের মুখোমুখি হতে হয়েছে পদে পদে। কেননা বিরোধী দলের সমর্থক শিক্ষক ও ছাত্ররা তাকে নির্বিঘ্নে কাজ করতে দেয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী যে উপাচার্য নিয়োগ করা হয় সেটি বেশ গণতান্ত্রিক কিন্তু দলীয় রাজনীতি সেখানে প্রবেশ করে প্রক্রিয়াটিকে বিতর্কিত করে তুলেছে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে তার মাধ্যমে উপাচার্যের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকদের নিয়ে একটি প্যানেল তৈরির প্রস্তাব রেখেছে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত হতে পারবেন। এটি উত্তম প্রস্তাব। এভাবে উপাচার্য নিযুক্ত হলে দলীয়করণের সম্ভাবনা থাকবে না এবং তখন উপাচার্যকে নিজ দলের শিক্ষক ও ছাত্রদের সন্তুষ্ট রেখে চলার ভার বহন করতে হবে না। রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা নয়, শিক্ষাগত এবং প্রশাসনিক উপযুক্ততাই তখন প্রাধান্য পাবে। ক্যাম্পাসের শান্তি শৃঙ্খ রক্ষার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকারকে প্রস্তাব গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হ

লেখক : কথাশিল্পী ও সাবেক সচি